সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস : তাঁর ইতিহাস-চিন্তার স্বরূপ

মো. ফজলুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ:** বাংলা সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক স্বতন্ত্র সারণির স্রষ্টা। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, মন্বন্তর, ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ ও বৈরী রাজনৈতিক উত্তাপ, ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সুনীল-মানসকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল। সুনীল ছিলেন বাস্তুহারার যন্ত্রণায় কাতর, দেশভাগের নির্মম শিকার। জন্ম ও বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তিনি এ চেতনা তাঁর মর্মমূলে ধারণ করেছেন। ব্রিটিশশাসিত পূর্ববাংলার এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে জন্ম ও বসবাসসূত্রে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার যে বৈরী রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সারা জীবন তাঁকে ভাবিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিষাক্ত ছোবলে যন্ত্রণাকাতর সুনীল এবং তাঁর পরিবারকে কীভাবে জন্মভূমির টান অগ্রাহ্য করে টিকে থাকার অদম্য তাড়নায় ভারতভূমিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে, সেই স্মৃতি তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন সারা জীবন। এর ফলে তাঁর অন্তঃসত্তায় উপ্ত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক বোধ, মানবিক উপলব্ধি ও জন্মভূমির প্রতি নস্টালজিক অনুভূতি। কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু হলেও কথাসাহিত্যে, বিশেষত ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস রচনায় তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে একাকার হয়ে গেছে মনুষ্যত্ব, কল্যাণ ও অসাম্প্রদায়িকতার বিশ্বজনীন স্রোত। সমকালীন সমাজ-রাজনীতির বিদ্যমান বাস্তবতাকে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের সঙ্গে একীকরণ করে কীভাবে তিনি তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস-চিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তা এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে।]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অসামান্য ব্যক্তিত্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)। সমসাময়িক সাহিত্যের তিনি উন্মুন্থনকারী প্রতিভা এবং শিল্পের অক্লিষ্ট কারিগর। তাঁর বিপুল সৃষ্টিযজ্ঞ অননুভবনীয় আস্বাদনে উদ্দীপিত, চিদানন্দে মুখরিত এবং গাঙ্গেয় স্রোতের মতো নিরন্তর প্রবাহিত। তদানীন্তন ফরিদপুর, বর্তমান মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার পূর্ব মাইজপাড়া গ্রামেই তাঁর পরিবারের আদিনিবাস। তাঁর কৈশোরমানস এ নিভৃত জনপদের আলো, বাতাস, জল আর মৃত্তিকার রসে ছিল পরিপুষ্ট। পূর্ব মাইজপাড়া ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল না। আড়িয়াল খাঁ নদীসংলগ্ন নিস্তরঙ্গ এ গ্রামের দৈনন্দিন জনজীবনে ছিল না কোনো আভিজাত্যের ছাপ। সহজ-সরল জীবনাচারে অভ্যস্ত এ জনপদের ব্রাহ্মণ পল্লির প্রান্তবর্তী পাঁচটি বাড়ির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পঞ্চম বাড়িটি ছিল অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের; যিনি ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতামহ। সুনীলের ঠাকুরদা বিয়ে করেছিলেন চারটি; মাতামহ দার পরিগ্রহণ করেছিলেন তিনবার। তাঁরা দুজনে ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। সুনীলের মাতামহের বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার আমগ্রাম বা আম গাঁ, লোকেরা বলত আমগা। এ আমগ্রামে সুনীলের জন্ম। তাঁর মাতামহের অবস্থা তাঁর ঠাকুরদার বাড়ির তুলনায় ছিল ভালো।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা।

https://doi.org/10.62328/sp.v57i1-2.6

আত্মজীবনীমূলক রচনা *অর্ধেক জীবন* (২০০২)-এ স্মৃতিচারণ করেছেন— 'আমাদের মাইজপাড়ার তুলনায় আম গাঁ বেশ বর্ধিষ্ণু, অনেক সচ্ছল লোকের বাস, বেশ কিছু পাকা বাড়ি, এমনকি দোতলা-তিনতলা, যা ঐ ধরনের গ্রামে তখনকার দিনে খুবই দুর্লভ ছিল।' (সুনীল, ২০১৪: ১২)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ছায়াঢাকা, তরুবেষ্টিত জল-কাদায় মাখামাখি পূর্ব মাইজপাড়ার মৃত্তিকার ঘ্রাণ যুগিয়েছিল বেঁচে থাকার রসদ। জন্মভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সে মৃত্তিকাকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি অবিমিশ্র টান তিনি জন্মাবধি অনুভব করেছেন। জীবনের কঠিনতম সংগ্রামের সময়ও তিনি পরমুখাপেক্ষী হননি। তাঁর বাপ-ঠাকুরদার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। নিজেদের অবস্থার বর্ণনায় তিনি লিখেছেন— 'আমাদের বাড়িটি মাটির দেওয়াল, ওপরে টিনের চাল। ছোট্ট উঠোন, তার একপাশে রান্নাঘর, অন্যপাশে আর একটি ছোট্ট ঘর, সেগুলির চাল খড়ের। সেই ব্রাহ্মণ পল্লীতে তিনটে বেশ বড় বড় পুষ্করিণী ছিল, কোনওটাই নিজস্ব নয় আমাদের। যান-বাহনের জন্য আমাদের নিজস্ব নৌকা বা গরুর গাড়িও ছিল না।' (সুনীল, ২০১৪: ১২)

পূর্বপুরুষের আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে বেড়ে ওঠা সুনীলমানস সর্বদা সহজ-সরল জীবনাচারে অভ্যস্ত ছিল। তাঁর শিশুচিত্তে নিত্য নানামাত্রিক কল্পনার নবোন্মেষ ঘটেছে; তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা ভাবিত ও তাড়িত হয়েছে। এ কথা স্বীকার্য যে, জন্মভিটা ও জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত জীবনযাপন তাঁর সত্তাকে সর্বদা বিপন্ন করলেও এতদঞ্চলের সংস্কৃতিগঙ্গায় তাঁর নস্টালজিক মন নিত্য দ্রবীভূত হতে চেয়েছে। ফেলে-আসা পিতৃপুরুষের ভিটেমাটির সোঁদা ঘ্রাণ তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে করেছে আবেগায়িত।

ঠাকুরদার বাড়িতে কাটানো শৈশব স্মৃতি রোমন্থন করেছেন— 'টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়িতে যে খুব কষ্টে ছিলাম, তা মনে হয় না। টিনের চালে কাক লাফালে ক্যাচোর-ম্যাচোর শব্দ হত, কিন্তু বৃষ্টির শব্দ ছিল আচ্ছন্ন করা মন্ত্রের মতন। একটাই অসুবিধে, মাটির ভিত কেটে চোর ঢোকা বেশ সহজ ব্যাপার, তাকে বলা হয় সিঁদ কাটা। কিছু কিছু ফলের গাছ, সব বাড়িতেই থাকে, আমাদের উঠোনে ছিল একটা জামরুল গাছ, বাড়ির একপাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ওখানকার ভাষায় বলে জাম্বুরা।... সেই গাছটাতে প্রচুর ফল হত, অত কে খাবে, সেই বাতাবি লেবু দিয়ে আমরা ফুটবল খেলতাম। একটা পুকুরধারে এজমালি বাগানে একটা খুব বড় আমগাছ, সে গাছের আমের নাম টিয়াঠুঁটি, যে-ই নাম দিয়ে থাকুক, তার উপমাজ্ঞান দারুণ।' (সুনীল, ২০১৪: ১২)

শৈশবাবধি তাঁর আত্মানুসন্ধানী মন আত্মাবিষ্কারের প্রচেষ্টায় সর্বদা নিমগ্ন থেকেছে। তিনি জীবনের প্রতি ছিলেন প্রবলভাবে প্রসক্ত। জীবনের পদে পদে প্রাপ্ত বাধাকে তিনি অপসারণ করেছেন এবং তুষ্টচিত্তে এগিয়ে গেছেন একজন নির্ভীক সারথি

রূপে। আমগ্রামে সুনীলের মায়ের মামারা ছিলেন ছোটখাটো জমিদার। সে বাড়ির কর্তা তাঁর মায়ের বড় মামা হলেও মায়ের মেজ মামা ছিলেন ওই সংসারের সবচেয়ে ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। মায়ের মেজমামার বর্ণনা সুনীল দিয়েছেন এভাবে— 'মায়ের মেজমামা কিন্তু ছিলেন খুবই সুপুরুষ।... সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন গাঙ্গুলি নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি, অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তি, তখনকার দিনের ডিএসসি, পিআরএস, অনেক বছর ধরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক বিভাগের প্রধান। তিনি গ্রন্থকারও ছিলেন। জ্যামিতি, অ্যালজ্যাবরা, ট্রিগনোমেট্রির টেক্সট বই রচনা করেছিলেন অনেকগুলি, স্কুল ও কলেজের।' (সুনীল, ২০১৪: ১৩)

সুনীলের মাতামহীর নাম ছিল মনোরমা। তিনি ছিলেন সুরেন গাঙ্গুলির ভগিনী। মনোরমার সাথে বিয়ে হয় বিরাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই দম্পতির ছিল দুই মেয়ে — মীরা (বড়), কুসুম (ছোটো) এবং এক ছেলে যতীন। সুনীলের দিদিমা মনোরমা ছিলেন পতিগৃহ-বঞ্চিতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন চাকরির সূত্রে কলকাতাতেই বেশিরভাগ সময় অবস্থান করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ব্রজবাসিনী। ব্রজবাসিনীর স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন পতিগৃহ-বঞ্চিতা বোন মনোরমাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন।

সুনীলের দিদিমা ছিলেন রন্ধনপটীয়সী। বাড়ির সকলের অসুখে-বিসুখে তিনি সানন্দে সেবা-শুশ্রূষার ভার নিতেন। মনোরমার ভ্রাতৃগৃহে অবস্থান সূত্রে তাঁর মেয়ে মীরাও কলকাতার জীবনে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। এ মীরাই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গর্ভধারিণী। সুনীল তাঁর মায়ের বর্ণনায় লিখেছেন— 'কিশোরী মীরা শুধু সুন্দরীই নয়, লেখাপড়াও শিখেছিল কিছুটা, এবং নিছক গ্রাম্য মেয়েও বলা যাবে না, অল্প বয়স থেকেই খানিকটা শহুরে আলো-বাতাসেরও স্বাদ পেয়েছিলেন।' (সুনীল, ২০১৪: ১৩)

সুনীলের ঠাকুরদারা ছিলেন মাইজপাড়ার দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। ঠাকুরদা অবিনাশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়। কালীপদ সেই অজপাড়াগাঁ থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতা শহরে পড়তে গিয়েছিলেন; লক্ষ্য ছিল পড়া শেষ করে একটি চাকরি জুটিয়ে নেওয়া। কালীপদকে কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের টাউন স্কুলে চাকরি দিয়েছিলেন মীরার মেজমামা সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলি। তখন কালীপদ বিএ শ্রেণিতে পড়তেন। সুনীল তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *অর্ধেক জীবনে* এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন:

> গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের ছেলে শহরে এসে শিক্ষকতা শুরু করলে, তা যথেষ্ট পদোন্নতিই বলতে হবে। মেসবাড়িতে থাকা, দেশের বাড়ি থেকে টাকা আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, কালীপদকে অর্থের জন্য অনেক উঞ্ছবৃত্তি করতে হত, তাই বি.এ পড়তে পড়তে তিনি চাকরির সন্ধান করেছিলেন।... অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন বেশ প্রতিপত্তিশালী, অনেক

> কলেজ ও স্কুল কমিটির সঙ্গে তিনি যুক্ত, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের টাউন স্কুলের তিনি সভাপতি, সেই স্কুলে তিনি কালীপদ নামের যুবকটিকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। (সুনীল, ২০১৪: ১৪)

পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলির মধ্যস্থতায় কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় মীরা গাঙ্গুলির। পিতৃপরিবারে মীরা গাঙ্গুলি অভাব-অনটনের মধ্যে বেড়ে উঠলেও তাঁদের অর্থকষ্ট কালীপদ গাঙ্গুলির মতো ছিল না। সংগত কারণেই নবতর জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি হন মীরা গাঙ্গুলি। পিতার চেহারা ও আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সুনীল লিখেছেন:

> মামা বাড়ির আশ্রিতা না হলে মীরা তার রূপ ও গুণের জন্য যোগ্যতর পাত্র পেতে পারত। কৌলীন্য ছাড়া কালীপদের আর কোনও বংশ গৌরব ছিল না, তিনি সুপুরুষও নন, বেঁটে খাটো চেহারা, ভালো মানুষের মতন গোল মুখ, গায়ের রং অবশ্য পরিষ্কার, অল্প বয়েস থেকেই টাক পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পারিবারিকভাবে খুবই গরিব এবং চাকরি হিসেবে শিক্ষকতা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অনেক স্কুলের শিক্ষকরা প্রতি মাসে প্রাপ্য মাইনের পুরোটাও হাতে পেতেন না। (সুনীল, ২০১৪: ১৪)

এরকম একটি দৈন্যদশাগ্রস্ত পরিবারে ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সাত তারিখে কালীপদ ও মীরা গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতির ঘর আলো করে ভূমিষ্ঠ হন এ কালের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী প্রবাদপ্রতিম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) যখন মহাপ্রয়াণ ঘটে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স তখন সাত বছর। সেই সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সুনীলের মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা অনেক বছর পরে সুনীল তাঁর *অর্ধেক জীবন*-এ তুলে ধরেছেন এভাবে—

> সেই বাইশে শ্রাবণে একটি সাত বছরের বালকের পক্ষে একজন অচেনা মানুষের মৃতদেহ দেখার জন্য ব্যাকুল হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। অন্যদের সঙ্গে বিবেকানন্দ রোডের এক বাড়ির ছাদ থেকে উঁকি মেরেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এমনও হতে পারে, এত দেরি হচ্ছে কেন ভেবে অস্থির হয়েছি, কখন শেষ হবে (শব যাত্রার মিছিল), কখন পাড়ায় ফিরে গিয়ে খেলাধুলা করব, এই চিন্তাই প্রধান ছিল। (সুনীল, ২০১৪: ২৬)

রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন করতে, তাঁর সাহিত্যে মগ্ন হতে সুনীলের সময় লেগেছে পরবর্তী আরো কয়েক বছর এবং স্বতন্ত্র সীমারেখা চিহ্নিত করতে তাঁকে পরিণত বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। সময় ও বস্তুজ্ঞানে প্রাগ্রসর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> রবীন্দ্রনাথকে চিনতে এবং তাঁর রচনায় মগ্ন হতে আমার আরো পাঁচ-ছ' বছর সময় লেগেছে। তারও অনেক পরে ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথ সঠিক সময়েই এই মর্ত্যধাম থেকে প্রস্থান করেছেন। আরও বেঁচে থাকলে তাঁকে বড় বেশি মর্মযাতনা ভোগ করতে হত। আজীবন যিনি সুন্দরের পূজারী, তিনি কি সহ্য করতে পারতেন, তাঁর এই প্রিয় শহর, তাঁর

> ভালোবাসার এই সোনার বাংলা, এমন কী গোটা দুনিয়াটাই নরকে পরিণত হওয়ার বাস্তবতা?...
>
> তিনি আঁচ করতে পেয়েছিলেন, টের পেয়েছিলেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,' কিন্তু তারও পরবর্তী মানবতার বিপর্যয় সম্ভবত তাঁরও কল্পনার অতীত ছিল। (সুনীল : ২০১৪ : ২৬)

একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষবাষ্প, অন্যদিকে ১৯৪৩-এর সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রা করে তুলেছিল দুর্বিষহ। এ সময়ে মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের দৃশ্যপট বদলে যায়। নগর জীবন থেকে গ্রামীণ জীবনের সর্বত্র এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাবার চাকরি সূত্রে দেশভাগের অনেক আগেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের বাড়িতে গেলেও যাওয়া হতো বছরে দু-এক বার। এ সূত্রে তাঁর মানসলোকে গ্রাম ও শহর জীবনের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। লেখক সে কথা স্বীকার করে লিখেছেন:

> এক হিসেবে আমি সৌভাগ্যবান, আমার বাল্য-কৈশোরকাল শহর ও গ্রাম, দু'জায়গাতেই কেটেছে। একেবারে খাস বাঙাল বাড়ির ছেলে হয়েও আমি পাঠশালার বয়েস থেকেই কলকাতার ঘটি ভাষা বলতে পারি, আবার গ্রামে গিয়েই সহ-খেলুড়েদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি চোস্ত বাঙাল ভাষায়। ট্রেন থেকে শিয়ালদা স্টেশনে নেমেই খেয়েচি-বলেচি আর ওদিকে স্টিমার থেকে নেমে খাইসি— বলসি! কলকাতার শান বাঁধানো পথে আছাড় খেয়ে আমার মাথা ফেটেছে, আবার গ্রামের আদিগন্ত পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি চলে গেছি সূর্যাস্তের দিকে। (সুনীল, ২০১৪: ১৮)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় এক বছর ছায়াঢাকা, পাখি ডাকা, সবুজে ঘেরা গ্রাম মাইজপাড়ায় অবস্থান শেষে আবার কলকাতার জীবনে ফিরে আসেন। এরপরে আর কখনও এত দীর্ঘসময়ের জন্য গ্রামে ফেরা হয়নি তাঁর। বিচ্ছিন্নভাবে এসেছেন দু-একবার, তবে তা অনাহূত আত্মীয়ের মতো। জন্মভূমির সাথে বন্ধন ছিন্ন হলেও জন্মভূমিকে তিনি কখনো বিস্মৃত হননি। তাঁর সাহিত্যে 'জলের মতন ঘুরে-ফিরে' জন্মভূমির নস্টালজিক অনুভূতি বার বার আলোড়ন তুলেছে; সে অনুভূতির গভীরসঞ্চারী প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যে।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। পরবর্তীকালে এ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পাবনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সন্দ্বীপে; অতঃপর বিহারে ও পাঞ্জাবে। একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন, অন্যদিকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষবাষ্পে যখন জর্জরিত ভারতবর্ষ; তখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক বছর পূর্ণ না হতেই এল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। দেশভাগ এবং জন্মভূমি হারানোর

বেদনা সুনীলকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। *অর্ধেক জীবনে* তিনি লিখেছেন— 'দেশ স্বাধীন হল, আমরা দেশ হারালাম।' (সুনীল, ২০১৪: ৮৩)

অর্জুন (১৯৭১) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক পূর্ববাংলায় ফেলে-আসা শৈশব স্মৃতিকে তুলে ধরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেশ ছেড়েছিলেন এগারো বছর বয়সে। অর্জুনও এগারো বছর বয়সে পূর্ববাংলা ছেড়ে আসে। অর্জুনের মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর দুরন্ত শৈশবের চিত্র তুলে ধরেছেন। হঠাৎ করেই লেখক ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা জানতে পারেন— তাঁর এতদিনের ভারতবর্ষ এখন হয়ে গেছে পাকিস্তান। জন্মভূমির প্রতি হার্দ্য মমত্ববোধ ও প্রগাঢ় টান তিনি সর্বদা অনুভব করতেন। তাঁর সাহিত্যে সেই অনুভব মৃত্তিকার ঘ্রাণের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এজন্য বিভাগোত্তর পর্যায়ের দিনগুলোতে তিনি মাতৃভূমির কথা বিস্মৃত হননি। দেশভাগ তাঁর নস্টালজিক মনে কতটা বিষাদের ছায়া ফেলেছিল সে কথা তিনি *অর্জুন* উপন্যাসে জানিয়েছেন এভাবে:

> দেশভাগ হবার ফলে অনেকে অনেক কিছু হারিয়েছে। কত লোক হারিয়েছে প্রাণ, কত লোক হারিয়েছে যথাসর্বস্ব। আমি যদি বলি, আমি হারিয়েছি আমার ওই পেনসিল আর মাউথ অর্গানটা, তা হলে হয়তো অদ্ভুত শোনাবে। কিন্তু ওই দুটিই ছিল আমার সম্পদ। আমি হারিয়েছি, আমার ছেলেবেলার লাল-নীল রুপালি স্বপ্ন। পুকুরধারে, বাঁশবাগানে, বেতের ঝোপের পাশে— যেখানে যেখানে আমি একলা একলা আমার মাউথ অর্গান বাজাতাম, সেই সব জায়গায় গাছপালা পরে দেখেছে আমার থেকে থেকে ফুঁপিয়ে-ওঠা বুকচাপা কান্না। (সুনীল, ২০১৪খ: ১৮৯)

জন্মভূমি হারানোর কষ্ট তাঁকে সর্বদা বিপন্ন করেছে এবং এ কারণেই ছেড়ে-আসা পিতৃভূমির টান তিনি সব সময় অনুভব করেছেন। তাঁর *অর্জুন* (১৯৭১), *পূর্ব পশ্চিম* (অখণ্ড ২০১২) উপন্যাসে এবং বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় সেই সূক্ষ্ম কোমল এবং মন্ময় অনুভূতির কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন স্মৃতিবিধুর বর্ণনায়। শৈশবের আড়িয়াল খাঁ নদী, বিস্তীর্ণ পাটক্ষেত, সবুজ ধানক্ষেত, টিয়াঠুঁটি আমবাগান, গন্ধরাজ ফুল, ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি পোকার মিছিল, লেবুপাতার ঘ্রাণ, বটগাছে তক্ষকের ডাকের মতো অনেক স্মৃতিময় অনুষঙ্গ দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। *অর্জুন* উপন্যাসে অর্জুনের ভাষ্যে সে সবের স্মৃতিচারণা করেছেন লেখক কাব্যিক ভাষায়— "যাবার সময় 'যাই' বলতে নেই, বলতে হয় 'আসছি'। কিন্তু আমরা আর কোনদিন ফিরে আসব না। সেই ধানক্ষেতে কইমাছ ধরা দুপুর, ভাতে লেবুপাতার গন্ধ, বটগাছে তক্ষকের ডাক, সাঁতার কেটে স্কুলে যাওয়া, ভূতের ভয়ে গা ছমছমানি, খেজুর গাছে উঠে রস চুরি করা, অমলাদির হাত থেকে মিষ্টি খাওয়া, হরতকি গাছের নিচে গোসাপের দেখা পাওয়া— এসব মিলিয়ে আমার যে জন্মভূমি, তাকে ছেড়ে এলাম।" (সুনীল, ২০১৪খ: ১৯৬)

দেশভাগের পরে পূর্ববাংলা থেকে একে একে অবস্থাপন্ন হিন্দুরা ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। বাঁড়ুজ্যে, দত্ত, সরকার, রায় প্রভৃতি পদবিধারী অবস্থাপন্ন হিন্দুরা কলকাতায় চলে যেতে থাকে। হিন্দুদের পূর্ববাংলা ছেড়ে যাওয়ার পেছনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভূ-রাজনীতির বিষবাষ্প প্রণোদনা যুগিয়েছিল। দেশভাগ পূর্ববাংলার মুসলমানদেরকেও পুরোপুরি স্বাধীনতা দিতে পারেনি। পূর্ববাংলার মুসলমানেরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দূরে সরে যেতে থাকে ।

পাকিস্তানি শাসনামলের শুরু থেকে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। পাঞ্জাব, করাচি, বিহার থেকে আগত মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন করত বেশি। হিন্দুরা তাদের সম্পত্তি মুসলমানদের কাছে জলের দামে বিক্রি করতে শুরু করে। অনেক সুযোগসন্ধানী মুসলমান সে সময় অবস্থাসম্পন্ন হিন্দুদের সম্পদ নামে-বেনামে ক্রয় করে নেয় । মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ আবার হিন্দুদের রেখে যাওয়া সম্পদ ভোগদখল করে। ওইসব হিন্দু বাড়ির পুরোনো আসবাব, জানালা-দরজা কিছু সুযোগসন্ধানী মুসলমান খুলে নিয়ে যায়। লেখকের *অর্জুন* উপন্যাসে এর বর্ণনা উঠে এসেছে— 'বাঁড়ুজ্যেরা জমিজমা কতটা কী বিক্রি করেছিলেন জানি না, বাড়িটা এমনি পড়ে রইল। খাট আলমারি যে-যা পারল নিয়ে গেল, সদরের লোহার গেট, প্রত্যেক ঘরের দরজা-জানালাও অদৃশ্য হয়ে গেল আস্তে আস্তে।' (সুনীল, ২০১৪খ: ১৯০)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেশভাগের নির্মম শিকার; বাস্তুহারার যন্ত্রণায় দগ্ধ। যেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, যে মাটির ঘ্রাণ তিনি গায়ে মেখেছেন, যেখানকার আড়িয়াল খাঁর জলে তিনি উদ্দাম সাঁতার কেটেছেন, প্রকৃতির ছায়াতলে বেড়ে উঠেছেন, তাঁর স্মৃতিকাতর মানসভুবন সে-অঞ্চলের রূপ-রস-গন্ধে বারবার পরিপ্লুত ও দ্রবীভূত হয়েছে। এ জন্যে সময়,ইতিহাস,ঐতিহ্য ও যাপিত জীবনের উপরিতল থেকে শুরু করে ভেতরের দগদগে ক্ষতকে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে প্রমূর্ত করে তুলেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। একদিকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিপুণ ও নির্ভীক প্রতিচিত্র উপস্থাপন, আরেকদিকে ব্যক্তিহৃদয়ের গোপন কুঠরিতে সন্ধানী আলো ফেলে তার সমুদয় বৈভব ও বিকৃতির অসামান্য কথারূপ দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর বিচিত্র সাহিত্যকর্ম।

১৯৫৩ সালে *কৃত্তিবাস* পত্রিকার গোড়াপত্তন ঘটে। তখন সুনীলের বয়স মাত্র উনিশ বছর। *কৃত্তিবাসের* ত্রয়ী সম্পাদকের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত থাকার যে নিরলস প্রচেষ্টা ও প্রয়াস তিনি চালিয়েছেন, *কৃত্তিবাসের* গোড়াপত্তন করে তিনি যেন তাঁর সেই সংকল্পের একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। 'নতুন কালের প্রত্যয়দীপ্ত তরুণেরা এতে সমবেত হতে লাগল তার উন্মুক্ত আঙিনায়। ফলে কৃত্তিবাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে লাগল একটি নতুন কবিতাযুগ।

তার রং, রুচি, গতি-প্রকৃতি সবকিছুই রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেখানে শুধুমাত্র শালীন শব্দের সমাহারে গড়া, সেখানে শালীন-অশালীনের ভেদ রেখাটিকেই তারা চাইলেন উঠিয়ে দিতে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আনুগত্য প্রশ্নহীন, এরা সেখানে তাকে করে তুললেন প্রশ্নসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী সৌন্দর্য ও কল্যাণবোধ থেকেও তারা তাদের কবিতাকে বিমুক্ত করলেন। শব্দ, ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ভাব, বিষয়— সবকিছু নিয়েই চালালেন নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।' (সরদার, ২০০৩: ৯৯)

কবিতা রচনার মাধ্যমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যযাত্রা সূচিত হলেও তিনি সারাজীবন বিচিত্র আঙ্গিকে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস মানে ও পরিমাণে বেশ সমৃদ্ধ। বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করলেও তাঁর ঔপন্যাসিক খ্যাতির মূল কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *আত্মপ্রকাশ* প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি রাজনীতি ও ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস রচনায় মনঃসংযোগ করেন। এক্ষেত্রে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং তৎপরবর্তী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম তাঁকে ইতিহাসনির্ভর কথাসাহিত্য রচনায় প্রণোদনা যুগিয়েছে। তিনি নিজে দেশভাগের নির্মম শিকার; বাস্তুহারার যন্ত্রণায় দগ্ধ। একটা দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ সময়, সমাজ ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে তাঁর উপন্যাসের কাঠামো বিনির্মিত হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগ্রত কলকাতা থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরাকে ছুঁয়ে একুশ শতকের প্রান্তবর্তী মুক্তিযুদ্ধোত্তর ঢাকা এ বিশাল ইতিহাস-ভূগোলে ব্যাপ্ত জীবনপ্রবাহ সুনীলের মহাকাব্যিক উপন্যাসসমূহে বর্ণিল রেখায় প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল সংসিদ্ধ। এ কারণে *অর্জুন* (১৯৭১), *সেই সময়* (অখণ্ড ১৩৯৮), *পূর্ব-পশ্চিম* (অখণ্ড ২০১২), *প্রথম আলো* (অখণ্ড ২০১৪) প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা ও সমাজভাবনা সংবেদ্য মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা প্রতিস্পন্দিত হয়েছে কালিক দ্বান্দ্বিকতার পথ ধরে। সেখানে বাংলার রেনেসাঁসের কাল এবং সেকাল-কেন্দ্রিক ইতিহাস-প্রদীপ্ত চরিত্র প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখের সরব উপস্থিতি, সমকালীন অন্ধ কুসংস্কার, কলকাতার বাবু সমাজের অপসংস্কৃতি চর্চার চিত্র, নারীশিক্ষার বিস্তার, প্রথাগত নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ ও বর্জনের পাশাপাশি আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা (*সেই সময়*) যেমন তাঁর লেখনীর দর্পণে প্রমূর্ত হয়েছে তেমনি ইতিহাসের বিষয় হিসেবে এসেছে ত্রিপুরার রাজদরবার এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার (*প্রথম আলো*)। ঠিক একইভাবে র‍্যাডক্লিফের শানিত ছুরিতে দ্বিখণ্ডিত বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের অশ্রু ও রক্তের দুরপনেয় ইতিহাস (*পূর্ব-পশ্চিম*) তাঁর কথাসাহিত্যে ভাষারূপে প্রমূর্ত হয়েছে।

সেই সময় উপন্যাসে বাংলার রেনেসাঁসকে প্রেক্ষাপট করে ইতিহাসসংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ, খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনপ্রবাহ, সমাজ সংস্কারে তাদের অবদান, ব্রিটিশ শাসনাধীন নগর কলকাতার চালচিত্র,

সতীদাহ প্রথা রদ; শিক্ষাবিস্তারে ডেভিড হেয়ার ও ওয়াটার বীটন প্রসঙ্গ, হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রথাবিরোধী কর্মকাণ্ড, সিপাহি বিদ্রোহ, চাষিদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের নিপীড়ন, নির্যাতন ও দুঃখ-দুর্দশার ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আদলে বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয় তা বাঙালির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, ধর্মদর্শন ও মানসভুবনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। আত্ম-উদাসীন বাঙালি আত্মআবিষ্কারের পথ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষাসহ সকল দিকে এক অভাবনীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি পরভাগ্যোপজীবী না হয়ে এ সময় নবোদ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।' (শিবনাথ : ২০০৭ : ৬৩) *সেই সময়* উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ নবযুগের প্রভাব ও পরিবর্তনকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন। এ উপন্যাসের শেষে 'লেখকের কথা'য় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— 'শিবনাথ শাস্ত্রী যাকে নবযুগ বলেছেন, পরে তারই নাম হয় 'বেঙ্গল রেনেশাঁস' এবং সে বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। গত শতাব্দীর এই রেনেশাঁসের ধারণাটিকে নাড়াচাড়া করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য।' (সুনীল, ১৪১৬: ৭০৫)

বাংলার এ নবজাগরণের উন্মেষপর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হচ্ছেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪- ১৮৩৩)। তিনি একদিকে যেমন সমাজ সংস্কারক; অন্যদিকে ধর্মসংস্কারকও বটে। রামমোহন 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা গড়ে তোলেন। সেখানে একেশ্বরবাদী ধর্ম সংক্রান্ত আলাচনা প্রাধান্য পায়। তিনি নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজ ছিল তাঁর একেশ্বরবাদী চিন্তা-চেতনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে রামমোহনের প্রচেষ্টা, জনমত গঠন ও আন্দোলনের ফলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর তারিখে সতীদাহ প্রথাকে আইন করে বন্ধ করে দেন।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূলকে নাড়া দিয়ে সে স্থলে একেশ্বরবাদী চিন্তার উদ্ভাবক রাজা রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করে এবং সতীদাহ প্রথা রদ করে বাংলার নব জগরণের 'প্রভাত সূর্য' রূপে সকলের কাছে সমাদৃত হয়ে রয়েছেন। *সেই সময়*

উপন্যাসে সুনীল ঐতিহাসিক রামমোহনকে নয়, এক অপার মানবিক গুণ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী রামমোহনকে ভাষারূপে প্রদীপ্ত করে তুলেছেন।

কাহিনির উপস্থাপন ও বয়ানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের যে বাতাবরণ তৈরি করেছেন তা তাঁর এই এপিকধর্মী উপন্যাসটিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। ইতিহাস চেতনার নবীকরণ করতে গিয়ে তিনি *সেইসময়* উপন্যাসে সেকালের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও সমাজ সংস্কারে পরিত্রাতা হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেছেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর ঠিক এক বছর পরে ১৮৫৬ সালে সরকার কর্তৃক বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। সতীদাহ প্রথা নিবারণের পর হিন্দু সমাজে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *সেই সময়* উপন্যাসে হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরকে ইতিহাস চেতনার পরিকাঠামোয় পুনর্মূল্যায়ন করে গদ্য ভাষাচিত্রের মাধ্যমে তাঁর পৌরুষের অবয়বটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন— 'বিদ্যাসাগর তাঁর যুগের ব্যতিক্রম নন, বরং সেই যুগেরই এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।' (কাজী আবদুল, ২০১৬: ৬৯)। মানবীয় গুণসম্পন্ন বিদ্যাসাগরের রূপচিত্রাঙ্কনে সুনীল কোনো দেব-মাহাত্ম্য আরোপ করেননি; তিনি ইতিহাসকে পরিপ্রেক্ষিত করে আপসহীন ব্যক্তিত্বসপন্ন বিদ্যাসাগরকে সেকালের একজন বলিষ্ঠ কর্মবীররূপে অঙ্কন করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমকালে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তেজঃপূর্ণ আবির্ভাব ঘটে মাইকেল মধুসূদন দত্তের। তাঁর মতো প্রতিভা সেকালে ছিল বিরল। ঐতিহাসিক এই ট্রাজিক চরিত্র তাঁর সময়কে প্রদীপ্ত করে *সেই সময়* উপন্যাসে মানবিক সত্তায় চিত্রিত হয়েছেন। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিরূপতা এবং পরবর্তীকালে আকর্ষণ তাঁর জীবনে বৈপরীত্য তৈরি করেছে। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা তাঁর মনকে খরতাপে দগ্ধ করলেও পরবর্তীকালে, সেই বিপন্ন মন বাংলা সাহিত্যের রসে দ্রবীভূত হয়ে প্রসন্নতা ছড়িয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মোড়কের খোলস থেকে বাংলা কাব্যের পরিত্রাতা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে গৌরবের।

মধুসূদন দত্তের সমগ্র জীবনব্যাপী চলেছে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। যার প্রতিফলন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনেও কম-বেশি পরিদৃশ্যমান। এ কারণে ইতিহাসের এ দোষে-গুণে মিশ্রিত চরিত্রটিকে *সেই সময়* উপন্যাসে তিনি বিনির্মাণ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্যক্তিজীবনের ভেতর ও বাইরে যে গভীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা ছিল তা সুনীল মানসকে গভীরভাবে কৌতূহলী করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি *সেই সময়* উপন্যাসে মধুসূদনকে ইতিহাসআশ্রিত মানবিক চরিত্ররূপে রূপায়ণে প্রণোদিত হয়েছেন।

সেই সময় উপন্যাসের নায়ক নবীনকুমার তথা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)-কে সুনীল উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের প্রতীকরূপে উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন।

ইতিহাসের ক্ষণজন্মা এ চরিত্রটির জীবন ঘটনাবহুল; নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও স্রোত-প্রতিস্রোতে বেগবান। একদিকে সুরাপানে যেমন তাঁর আসক্তি ছিল; অন্যদিকে তাঁর হাতেই লিখিত হয়েছে *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২), সম্পাদিত হয়েছে *মহাভারত* (১৮৫৮-১৮৬৬), প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩), বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, মাসিকপত্র *সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা* (১৮৫৬) প্রভৃতি। তিনি যেমন ছিলেন *বিবিধার্থ-সংগ্রহ* ও *পরিদর্শক* নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, তেমনি ছিলেন *বাবু* (১৮৫৪), *বিক্রমোর্বশী* (১৮৫৬), *মালতীমাধব* (১৮৫৬), *সাবিত্রী সত্যবান* (১৮৫৮) প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা। জীবনের প্রতি আসক্তি ও অনাসক্তি প্রবলভাবে নবীনকুমার চরিত্রে বহমান ছিল। উনিশ শতকের এ স্বল্পজীবী ব্যক্তিত্ব সুনীল-মানসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে এ চরিত্রটিকে পটে রেখে তিনি *সেই সময়* উপন্যাসের কাহিনি বয়ান ও ব্যাখান এবং চরিত্রসমূহ সৃজন করেছেন। *সেই সময়* ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত রেনেসাঁসের প্রভাবজাত উপন্যাস। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ও মধ্যভাগের নানা ঐতিহাসিক চরিত্র ও সেসব চরিত্র-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ উপন্যাসটিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। তিনি নিকট অতীতকালকে দূর অতীতের সঙ্গে মিলিয়েছেন, ইতিহাসকে সাঁকো করে সমকালকে বিনির্মাণ করেছেন। ইতিহাস-আশ্রিত চরিত্র ও কাহিনির নবীকরণে এখানে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা তুলনারহিত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ধারার উপন্যাসের আর এক সার্থক দৃষ্টান্ত *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাস। বৃহৎ কলেবরে রচিত এ উপন্যাসে একটি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বলয় রয়েছে, যার মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪), ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮), জেনারেল আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪), জেনারেল ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০), জুলফিকার আলী ভুট্টো (১৯২৮-১৯৭৯), মোনেম খান (১৮৯৯-১৯৭১), খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪), এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (১৮৯২-১৯৬৩), মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) প্রমুখের রাজনীতি; দ্বিজাতি তত্ত্ব, নকশালপন্থী রাজনীতি, উদ্বাস্তু সমস্যা, ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭-এর দেশভাগ, ১৯৪৬ ও ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৭-এর কাগমারি সম্মেলন, ১৯৫৮-এর পূর্ববাংলায় ঘূর্ণিঝড়, আইয়ুবি শাসন ও বেসিক ডেমোক্রেসি, ১৯৬৪ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৭০-এর নির্বাচন, ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা ঘটনা ও উপঘটনা। এ উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ যেখানে চিত্রিত হয়েছে সেখানে অনিবার্যভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা গুরুত্ব পেয়েছে।

অপরদিকে অতীন মজুমদার, মমতা, বুলা, সুপ্রীতি, সুহাসিনী, বিশ্বনাথ, তুতুল, আলম, পিকলু, বাবলু, ওলি, শর্মিলা, সমীর, কৌশিক, পমপম, ত্রিদিব, সুলেখা, শাজাহান, অসমঞ্জ, হীরাতমণ্ডল, মামুন-মঞ্জু প্রভৃতি চরিত্রের কাহিনিবৃত্ত যেখানে রচিত হয়েছে সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে মানবীয় অনুভূতির যোগে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে একটি কালের অন্তরঙ্গ বয়ান। '*সেই সময়* উপন্যাসে যে লেখক উনিশ শতকীয় বাঙালির নবজাগরণের বাঙ্ময় রূপ দিয়েছেন, তিনি *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে মহাকাব্য সুলভ বিশাল আঙ্গিক আয়তনে আধুনিক মানবচেতনার উত্থানকে দেখিয়েছেন। *সেই সময়* উপন্যাসে ইতিহাস ও জীবন প্রায় সমানভাবে উপস্থিত কিন্তু *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে ইতিহাসের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে জীবন ইতিহাস।' (মঞ্জুভাষ, ২০১৩: ৬৫)

মানবিক সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া, মূল্যায়ন, পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে সুনীল মানবিক। ইতিহাসের ঘটনা, চরিত্র চিত্রণ ও পটভূমি বিনির্মাণে তিনি মানুষী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। ইতিহাসের সাথে মানব জীবনের অন্বয় সাধন তথা সাঁকো নির্মাণে মানবজীবনঘনিষ্ঠ জীবনাভিজ্ঞতাকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ইতিহাস এক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে মানবিক অনুভূতির আধার।

জীবনেতিহাস রূপায়ণে তিনি ইতিহাসের নির্যাস এবং জীবনের রসকে একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিয়েছেন। জীবন-ইতিহাসের পানপাত্রে জীবনরসের উপস্থিতিতে তা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। তাঁর *অর্জুন* উপন্যাসে (১৯৭১), আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *অর্ধেক জীবন* (২০০২)-এ এবং বিভিন্ন কবিতায় পূর্ববাংলা তথা জন্মভূমিকেন্দ্রিক যে নস্টালজিক অনুভূতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তার ক্রমপ্রসারিত রূপ *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসেও দৃশ্যমান। প্রতাপ চরিত্র এ নস্টালজিক অনুভূতির ধারক। কেন্দ্রীয় এ চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুনীল মানস নস্টালজিক অনুভব দ্বারা তাড়িত হয়েছে এবং সে অনুভব প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের প্রতি ছত্রে। প্রতাপ মজুমদারের পিতা ভবদেব মজুমদারের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের মালখানগরে। প্রতাপের শৈশব ও কৈশোরের রঙিন দিনগুলো সেখানে কেটেছে। পূর্ববঙ্গের মালখানগর ঘিরে তার রয়েছে বিস্তর নস্টালজিক স্মৃতি। তাই দেশভাগের পর পিতার মৃত্যুতে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে প্রতাপ মজুমদারের মন হয়ে উঠেছে স্মৃতিকাতর—

> বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল, মাটি থেকে উপড়ে তোলা হল এক বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের শিকড়। পূর্ববাংলার এই নদীময় প্রান্তর, এই মিঠে বাতাস, খেজুরের রসের স্বাদের মতন ভোর, ঠাকুমার গল্পের আমেজ মাখা সন্ধ্যা এসব আর দেখা হবে না। এরপর কলকাতার ভাড়াটে অন্ধকার ঘুপচি ঘরে চির নির্বাসন। দেশ বিভাগের পরেও প্রত্যেক বছর পুজোর সময় একমাস সপরিবারে প্রতাপ কাটিয়ে যেতেন মালখানগরে। সেই একমাসেই যেন সারা বছরের এনার্জি সঞ্চয় করে নিতেন। নিজেদের

> পুকুরের মাছের স্বাদই আলাদা। বাড়ির গোরু, বাড়ির কলাগাছ, এমনকী চিঁড়ে-মুড়কিও নিজেদের খেতের। তাছাড়া যে মাটিতে পিতৃপুরুষেরা পদস্পর্শ রেখে গেছেন, সেই মাটি। পুজোর সময় প্রতাপ কাশ্মীর গোয়ায় ভ্রমণের আহ্বান পেলেও প্রত্যাখ্যান করতেন। (সুনীল, ২০১৩: ৪১০)

পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মানবিক বিপর্যয় দ্বারা সুনীল মানস ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছে। পূর্ব বাংলার দুর্ভিক্ষে উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত আছড়ে পড়ে কলকাতায়। 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার প্রবাহিত হল উদ্বাস্তু স্রোত। এই লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের মাথা গোঁজার জায়গা কোথায়? সবাই ধেয়ে আসছে কলকাতার দিকে।... শিয়ালদা স্টেশনের কোনও প্ল্যাটফর্মে পা ফেলার জায়গা নেই, শুয়ে আছে মানুষ। ফুটপাতগুলি হাঁটার অযোগ্য হয়ে উঠল, সেখানে গড়ে উঠেছে মানুষের আস্তানা। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতা শহর নোংরা হতে শুরু করেছিল।' (সুনীল, ২০১৩: ৪১০)। ১৯৪৬ ও ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগ উদ্বাস্তু স্রোতকে আরো বেগবান করেছে। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে অবিশ্বাস, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছে। লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেশভাগের কিছু পূর্ববর্তী সময় থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাই তিনি দেশভাগের সময় স্বচক্ষে দেখেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু স্রোত। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, শেয়ালদা স্টেশনে তিনি শরণার্থীদের মানবেতর জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর মানসলোকে উদ্বাস্তু সমস্যা বা সংকট স্থায়ীভাবে দাগ কেটেছিল। বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কবিতায় তিনি উদ্বাস্তু সংকটকে চিত্রিত করেছেন।

সময় যত গড়িয়েছে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের তত অবনতি ঘটেছে। দুই সম্প্রদায়ের মনে সৃষ্টি হয়েছে দগদগে ক্ষত। এ অস্থির, বিভীষিকাময় ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেড়ে উঠেছেন। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এবং ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও টানাপড়েন, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর ওপর অকথ্য নির্যাতন ও বৈষম্যের চিত্র, পূর্ববাংলার মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধ তাঁর আগ্রহের বিষয় হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনা, ঘটনা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া এবং ঘটনার অন্তর্নিহিত গূঢ় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল ও অপতৎপরতা তাঁর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুনীল-মানস উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছে। তিনি উপমহাদেশের রাজনীতির চালচিত্র তাঁর *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে

প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। আদর্শহীন স্বার্থের রাজনীতি এবং ক্ষমতার পালাবদল, ভূ-কেন্দ্রিক রাজনীতির চরম আগ্রাসন, ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন, রাজনীতিবিদদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব, জনবিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক অপকৌশল প্রয়োগ করে ক্ষমতায় আরোহণ, সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ, অপরাজনীতি এবং অপশাসনের উত্তাল সময় ও ঘটনাপ্রবাহ সুনীল-মানসকে আন্দোলিত করেছে। *পূর্ব-পশ্চিমে* তিনি উপমহাদেশের রাজনীতির এসব বৈরী ঘটনাকে নিবিড়ভাবে চিত্রায়িত করেছেন। ভারত, পাকিস্তান তথা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমস্যা ও সংকটকে তিনি *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে এমনভাবে ভাষারূপ দিয়েছেন যা সময়ের জীবন্ত কাহিনিরূপে চিত্রিত হয়েছে। এ উপন্যাস মানবিক আখ্যানের পাশাপাশি হয়ে উঠেছে উপমহাদেশের জটিল রাজনৈতিক মেরুকরণের ভাষিক দলিল। *পূর্ব-পশ্চিম* উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের পাশাপাশি মানবিক কাহিনি গ্রন্থনেও সুনীলের দক্ষতা অতুলনীয়। উপন্যাসের চরিত্র ও গল্পের শরীরে তিনি ইতিহাসের উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাসমূহ তাঁর বর্ণনদক্ষতায় তৈরি করেছে মানবিক আবেদন। ইতিহাস ও মানবিকতাবোধের মিশ্রণে তাঁর উপন্যাসসমূহ হয়ে উঠেছে অনন্য ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাধর্মী উপন্যাস *প্রথম আলো*। এর কালপরিসর ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ। এর কেন্দ্রীয় ঘটনাংশ জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ। আর এ বিশেষ চেতনাকে রূপ দিতে গিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারা, থিয়েটার আন্দোলন, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবন ও ব্যক্তিজীবনের নানামাত্রিক রূপান্তর, জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে তরুণদের মতবিরোধ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও প্লেগ রোগ, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা সৃষ্টি এবং ত্রিপুরা রাজবংশের অনালোচিত অধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের ক্রমপ্রসারী বর্ণনা লেখক তুলে ধরেছেন *প্রথম আলো* উপন্যাসে।

প্রথম আলো উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত ভারতবর্ষের কিছু বিখ্যাত মনীষীর কর্ম ও সাধনার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। সুনীলমানস এসব মনীষীর কর্ম, চিন্তা ও চেতনার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁদের মধ্যে একজন। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন বহিরঙ্গে সরল, অন্তর্লোকে গভীর ভাবময়। তিনিই বলেছেন—'যত মত তত পথ।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের এ সাধক পুরুষকে উপন্যাসে খানিকটা রক্ত-মাংসের মানুষ করে অঙ্কন করার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রটি উপন্যাসে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সমন্বয়ক রূপে চিত্রিত হয়েছে। চরিত্রটির ভাববীজ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাস থেকে গ্রহণ করলেও চরিত্রটি সৃজনে তিনি ভক্তিরসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস আধেয়রূপে গৃহীত হয়েছে। *প্রথম আলো*

উপন্যাসে সৃজিত চরিত্রসমূহে তাঁর এ দ্বৈত বিশ্বাসবোধ বিভিন্নভাবে প্রকটিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ চরিত্র রূপায়ণে তাঁর এই বিশ্বাসের রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

প্রথম আলো উপন্যাসে কাহিনির বাতাবরণ সৃষ্টিতে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সরব উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশের অবিসংবাদিত নায়ক রবীন্দ্রনাথ এবং নায়িকা কাদম্বরী দেবী। '১৮৮৪ বঙ্গাব্দে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই নারীর প্রভাবের কথা রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই জানা। তাঁর জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনার প্রথম পাঠক ছিলেন কাদম্বরী দেবী— এই সময়ে তাঁর রুচির আনুগত্য তরুণ কবির পক্ষে প্রায় আবশ্যিক ছিল। অথচ তাঁর বন্ধনভীরু মন ক্রমেই এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করাতে প্রয়াসী হয়েছে, *সন্ধ্যাসংগীত*, *প্রভাতসংগীত* এবং *ছবি ও গান*-এর কবিতাগুলিতে লিখিত রয়েছে সেই সংগ্রামের ইতিহাস— যাকে বলা চলে কাব্য রচনার একটি সংস্কারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। মনে হয়, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু— যত দুঃসহ হোক-না কেন— এই সংগ্রামে জয়ী হতে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছে। তাঁর স্নেহ-মমতা আদর-যত্ন রবীন্দ্রনাথের মনে যেন একটি শৈশবাবস্থাকেই স্থায়ী করে রেখেছিল, এই মৃত্যুর অভিঘাত তাঁকে উত্তীর্ণ করে দিল যৌবনের দ্বার প্রান্তে।' (প্রশান্ত, ২০১৪: ০১)

প্রথম আলো উপন্যাসে রবীন্দ্র-চরিত্র নির্মাণে তিনি ইতিহাসের সত্যকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু চরিত্রটিকে বিকশিত করতে মানবিক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। তিনি ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাস ও কল্পনার সংশ্লেষ ঘটিয়ে মানবীয় রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত করেছেন। *প্রথম আলো* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের নবজগরণ-স্নাত ব্যক্তিত্বরূপে অঙ্কিত হয়েছেন। এই উপন্যাসের প্রথম পর্বে কাদম্বরী দেবী ও তাঁকে নিয়ে যে কাহিনিবৃত্ত রচিত হয়েছে সেখানে সুনীল ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে তাঁকে রক্তমাংসের মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন। এ অংশে কবিসত্তা আবেগ, অনুভব, প্রেমভাবনা, রোমান্টিকতা, শোক, বিরহ, পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। তবে উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রচরিত্র বিনির্মাণে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'রবীন্দ্র চরিত্রে আর একটি বিশিষ্ট মাত্রা দিয়েছে জাতীয়তার উপাদান ও স্বদেশপ্রেম। পাশাপাশি ঐতিহাসিক যুগসংকটের সঙ্গে ব্যক্তির সংকটের সন্ধিক্ষণও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার ভাবমূর্তি যেমন দেখা গেছে তেমনি তাঁর বিশ্বমানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার উদার রূপটিও অলক্ষ্য নয়।' (মঞ্জুভাষ, ২০১৩: ২০৬)

প্রথম আলো উপন্যাসে সুনীলমানস যেখানে রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা আবর্তিত হয়েছে সেখানে অনিবার্যভাবে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ এসেছে। এমনকি এ উপন্যাসে

লেখক স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রেক্ষাপট ও চিত্র উপস্থাপন করেছেন, সে প্রেরণার উৎসমুখ ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা। সুনীলমানস ইতিহাসচেতনার পাশাপাশি পরাধীন দেশের রাজনৈতিক চেতনা ও তার বৈরী উত্তাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। লেখক সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথকে বিনির্মাণ করেছেন। কখনো কখনো স্ব-স্বভাবের বাইরে গিয়ে বহুমুখী রবীন্দ্র প্রতিভার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যবোধ যে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) চেতনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল *প্রথম আলোর* ঘটনাংশ বয়নে তা সুস্পষ্ট। বিবেকানন্দের প্রখর ব্যক্তিত্ববোধ ও ভারতচেতনা তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করেছে। পরাধীন ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সত্যিকারের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান প্রথম জানিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। বিবেকানন্দ দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব— যিনি মনে-প্রাণে ভারতবাসীকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতাকে হৃদয়ে ধারণ করে সে চেতনাকে তিনি পাশ্চাত্য বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা, ভারতপ্রেম, স্বাদেশিকতা, আন্তর্জাতিকতা এবং সর্বোপরি বিশ্বমানবতাবোধকে উপন্যাসে মানবীয় রূপে উপস্থাপন করেছেন।

সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে প্রকাশ একটা সহজাত ক্ষমতা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কল্পনার সংশ্লেষ ঘটিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস তাঁর কাছে কেবল আরাধ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়নি; সস্নিগ্ধ প্রসন্নতা ছড়িয়ে লক্ষ্য অর্জনে তা হয়ে উঠেছে সহায়ক। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস হয়ে উঠেছে জীবন, সমাজ, স্বদেশ ও সময়ের এক অন্তরঙ্গ কথাচিত্র। তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস সময় ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবিকশিত হয়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনস্রোতকে তিনি অমোঘভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

কাজী আবদুল ওদুদ, ২০১৬। *বাংলার জাগরণ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

প্রশান্তকুমার পাল, ২০১৪। *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

মঞ্জুভাষ মিত্র, ২০১৩। *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য*, প্রতিভাস পাবলিশার্স, কলকাতা।

শিবনাথ শাস্ত্রী, ২০০৭। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সরদার আবদুস সাত্তার, ২০১৩। 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: যার গায়ে লেগে ছিল এ দেশের মাটির ঘ্রাণ', হাসান হাফিজ সম্পাদিত *সুনীল স্মরণে: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, মাটিগন্ধা পাবলিশার্স, ঢাকা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১০। *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র* দশম খণ্ড, বাণী বসু সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৩। *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র* নবম খণ্ড, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৪। *অর্ধেক জীবন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৪ক। *প্রথম আলো*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৪খ। *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র* তৃতীয় খণ্ড, বীরেন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ২০১৫। *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪১৬। *সেই সময়*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সৈয়দ হাসমত জালাল, ২০১৪। 'রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেই বিরোধী ছিলেন তিনি', *সুনীল হুমায়ূন*, রফিক উল ইসলাম ও হুমায়ূন কবীর ঢালী সম্পাদিত, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা।